

# আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

## উৎসর্গ পত্র।

কু নু মাং ত্বদধীনজীবিতং  
বিনিকীর্য ক্ষণভিন্সৌহৃদঃ।  
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো  
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥

স্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ  
উৎসর্গ হইল।

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংনস্যে মৎপরাঃ  
অন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।  
তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ  
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং।  
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়  
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ।  
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরং  
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তং ধনঞ্জয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ১২। অধ্যায়।

# সূচীপত্র

## উপক্রমণিকা

- প্রথম খণ্ড — প্রথম পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — তৃতীয় পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — চতুর্থ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — পঞ্চম পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — সপ্তম পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — অষ্টম পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — নবম পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — দশম পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — একাদশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — ষোড়শ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — বিংশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — একবিংশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
- প্রথম খণ্ড — পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
- দ্বিতীয় খণ্ড — প্রথম পরিচ্ছেদ
- দ্বিতীয় খণ্ড — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# আনন্দ মঠ। উপক্রমণিকা।

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়— শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, “আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, “আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি?”

প্রত্যুত্তরে বলিল, “পণ আমার জীবনসর্বস্ব।”

প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।”

“আর কি আছে? আর কি দিব?”

তখন উত্তর হইল, “ভক্তি।”

## প্রথম খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃগায় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুকুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাইল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাভ্যু আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজ ধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভাৰ্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভাৰ্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গোশালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, “এরূপে ক’দিন চলিবে?”

কল্যাণী বলিল, “বড় অধিক দিন নয়। যতদিন চলে; আমি যত দিন পারি চলাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া নগরে<sup>[১]</sup> যাইও।”

মহেন্দ্র। নগরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুইজনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। নগরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে।

ম। সেস্থান হয় ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এস্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, “এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুণ্ঠিয়া লইবে।”

ক। লুণ্ঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধসন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।”

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইঁহারা দুই জন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, “পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুণ্ঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।” এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, “যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।” এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?”

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।



জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পলল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্জন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব। এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়াছিল।

---

1. ↑ নগর বা রাজনগর—সাবেক বীরভূম রাজ্যের রাজধানী।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্যস্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুকুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেই খানে উপস্থিত হইল। দেখিল কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

---